Vol. 24 | No. 1 | 1980

Check for updates


# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## বাঙলা ছন্দের বিবর্তন


| | |
|---|---|
| Volume | 24 |
| Issue | 1 |
| Year | 1980 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | আবদুল কাদির |
| Published online | December 1, 1980 |
| DOI | 10.62328/sp.v24i1.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v24i1.1 |
| Pages | 1-22 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# বাঙলা ছন্দের বিবর্তন

আবদুল কাদির

আগে ভাষা, পরে ছন্দ। ভাষার উচ্চারণ-ভেদেই ঘটে ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ। কিন্তু বাঙলা ভাষার মূলগত উৎপত্তি এবং বাঙলা ছন্দের আদিমতম প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পণ্ডিত ও গবেষকগণ আজ পর্যন্তও একটা সমঝোতায় উপনীত হ'তে পারেন নি। বাঙলা ভাষার প্রাথমিক রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্বদেশেই হয়। পূর্বদেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, ···পূর্বীপ্রাচ্য বা মাগধী খুব সম্ভব খ্রী.পূ. চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে বাংলাদেশে তার জড় গাড়তে সমর্থ হয়। ··· তারপর সাত শ বছর ধ'রে মাগধী-প্রাকৃত আস্তে আস্তে বদ্‌লে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে মৈথিল মগহী), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল। এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলা ভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিলে : ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, চর্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হলো।[১]

পক্ষান্তরে এ-সম্বন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' পুস্তকে বলেন :

> হিন্দু সেন-রাজগণ সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাঞি পণ্ডিত ধর্মপূজার আদিম বাঙ্গালা পদ্ধতি রচনা করিয়া থাকিবেন। ···এই কালে বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যায় জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের চর্চা ছিল। সংস্কৃতির ঐক্যের কারণে এই তিন দেশে লোক-সাহিত্য ও ছন্দের ঐক্য দেখা যায়। খনার বচন, ডাকের বচন, এবং ধর্মমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের আদি কাব্য এই কালে রচিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাব জয়দেবের গীতিগোবিন্দে লক্ষিত হয়। ···
>
> বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী কোলজাতি আর্যভাষা ও আর্য সংস্কৃতি ক্রমশঃ গ্রহণ করে। অন্যপক্ষে তাহাদের দ্বারা আর্যভাষা ও আর্য সংস্কৃতিও অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। এইভাবে বাঙ্গালা জাতির ও বাঙ্গালা ভাষার গোড়াপত্তন হয়। ··· স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ···
>
> ভাষা-প্রবাহের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার পূর্বে অপভ্রংশ, তাহার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত-যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা। ···
>
> ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধগানের ভাষাকে শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন। কিন্তু সর্বনাম শব্দের ও ক্রিয়া রূপের ঋণ অসম্ভব। যাহা বলা হইল, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে, বাংলা তথা তাহার সহোদরা ভাষাগুলি মাগধী-প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। A. B. Keith প্রভৃতি মনীষীগণও এই মত পোষণ করেন। ···

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে কোন্ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। আমরা ইহাকে গৌড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি। দণ্ডী (ষষ্ঠ শতক) তাঁহার কাব্যাদর্শে গৌড়ী প্রাকৃতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ···আমরা গৌড়ী প্রাকৃতের কোনও নিদর্শন পাই নাই। ···

গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্বপ্রথম মৈথিলী উৎপন্ন হইয়া পৃথক হইয়া যায়। তৎপরে উড়িয়া, তৎপরে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে।···

আশ্চর্য্যচর্য্যাচর্য্যের টীকায় মীননাথের পরদর্শন হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম কুরঙ্গ সমাধি কপাট॥
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥
(চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়, ৩৮ পৃ.)

মীননাথের নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে যান। এই মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ যে দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, তাহা সর্ববাদীসম্মত। তাহা হইলে আমরা এই শ্লোকটিকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে পারি। ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে গিয়া পড়ে।

চর্যাপদের লেখক কাহ্নপাদ ও সরহ অপভ্রংশ ভাষায় দোহা রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সমকালে ও সাহিত্যের ভাষা-রূপে অপভ্রংশের ব্যবহার ছিল।[২]

অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ ভাষার প্রধান ছন্দ : দোহড়িকা বা দোহা, এবং পজ্ঝটিকা বা পাদাকুলক। নিম্নে চর্যাপদাবলী থেকে এই দুই ছন্দের নমুনা পরিবেশন করছি।

দোহা-ছন্দের পংক্তিতে সাধারণতঃ ১৩+১১ মাত্রা-ভাগের দু'টি পদ থাকে। কিন্তু চর্যাপদে কোথাও কোথাও ১২+১২ মাত্রা-ভাগে পংক্তি গঠিত হতেও দেখা যায়। যেমন—

VVVV VVVV VV— | —— V— V—— |
গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী।
—— ——VV —V |——— V——|
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
(চর্যা : ৫০)

উপরের প্রথম পংক্তিতে ১২+১২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৩+১১ মাত্রা রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটিতে বাংলা অক্ষরবৃত্ত রীতিতে দৃশ্যতঃ ১৪-অক্ষর আছে ব'লে কোনও গবেষককেই দোহা-ছন্দ থেকে অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উদ্ভব হয়েছে এরূপ বলতে অদ্যাবধি শুনিনি। অথচ তাঁদের কেউ কেউ পজ্ঝটিকায় বা পাদাকুলকে লক্ষ্য করেছেন বাংলা "পয়ারের পূর্বাভাষ"।[৩] পাদাকুলের দৃষ্টান্ত—

V V— —— VV— ——
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
VVV V —VV V VV V——
খনহ ণ ছাড়অ ভুসুকু অহেরী॥ (চর্যা : ৬)

সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দে থাকে ৮+৮+৮+৮ অক্ষর; আর এই প্রাকৃত পাদাকুলকে আছে ৮+৮+৮+৮ মাত্রা। ১২৮১ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সিদ্ধান্ত করেন যে, জয়দেব মিশ্রের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের—

সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥ (৪র্থ সর্গ, ১২ শ্লোক)

এবম্বিদ পাদাকুলকে-জাত ১৬-মাত্রার "গীতময় বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।"[৪] এর প্রায় ৭০ বৎসর পরে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমর্থন ক'রে উপরোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীরমেশচন্দ্র বসু তাঁর 'পয়ার ছন্দের উৎপত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন: 'শ্রীজয়দেব গোস্বামীর অমর গীতিকাব্য গীতগোবিন্দের ৪র্থ সর্গে পয়ার-ছন্দের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই।"[৫] কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় যেখানে বলেছেন যে, উক্ত 'গীত'-এর "সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়;" সেখানে রমেশচন্দ্র বসু তাকে বলেছেন: "বাঙ্গালা পয়ার-ছন্দের সহিত সর্বাংশেই সমান।" ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রসঙ্গতঃ শেখ শাদীর ফারসী বয়েত—

করীমা বে বখ্শায় বর হালে মা।
কে হাস্তেম আসীরে কমন্দে হাওয়া॥ (পন্দনামা)

উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করেন: "পয়ারের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু শুদ্ধ ঐ কারণেই এক বিজাতীয় ভাষার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতে যাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে-ছন্দের সহিত উহার কতক সাদৃশ্য আছে তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত।" ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা পয়ারের মূল সন্ধানের হেতু স্বরূপ বলেন: "যখন বাঙ্গালা ভাষারই আদি মূল সংস্কৃত হইল, তখন তদ্ভঙ্গীভূত ছন্দের মূলও যে সংস্কৃতই হইবে ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রথমে "পয়ারকেই অনুষ্টুভের স্থানীয় বলিয়া বোধ হয়;" কিন্তু পরে তিনি দেখেন; "শুনিতেও দুই ছন্দ (বাঙ্গালা পয়ার ও সংস্কৃত অনুষ্টুভ) কর্ণে একবিধ বলিয়া বোধ হয় না।"

শ্রীরাখাল রাজ রায় ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তাঁর 'বাঙ্গালার ছন্দ ও তাল' নামক নিবন্ধে বলেন: "অনুষ্টুভ হইতেই পয়ারের জন্ম।"[৬] কিন্তু এ-বিষয়ে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'পয়ারের উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধে মন্তব্য করছেন—

> এক সময়ে কেউ কেউ পয়ারকে সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দ থেকে উদ্ভূত ব'লে অনুমান করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন; কিন্তু এ-অনুমান যে তথ্যসম্মত বা যুক্তিসম্মত নয়, আশা করি এ-বিষয়ে এখন আর কোনো দ্বিমত নেই।[৭]

বাঙলা অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উদ্ভব সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' পুস্তকে "আধুনিক তথাকথিত 'স্বরাঘাতপ্রধান' অর্থাৎ শ্বাসাঘাতপ্রধান বা বলপ্রধান (stressed) ছন্দের একটি উদাহরণ" এবং তাহার ছন্দলিপি দিয়ে বলেছেন: "দুইটি উদাহরণেই দেখি যে, ছন্দের আসল কাঠামো হইতেছে পয়ারের, এবং সংবৃত অক্ষরের (অর্থাৎ যুক্ত ব্যঞ্জনের পরবর্তী স্বরধ্বনির) বাহুল্য কমাইলেই এগুলি তানপ্রধান

(অক্ষরবৃত্ত) পয়ারে পরিণত হইবে।"[৮] তাঁর এই বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট যে, ছড়ার ছন্দ তথা ধামালী তথা প্রত্ন-স্বরবৃত্তের কুক্ষি থেকেই অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উদ্ভব। অথচ তৎপূর্বে তিনিই বলেছিলেন :

> ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দ হইয়া দাঁড়াইল সমমাত্রক চতুর্দশাক্ষরাত্মক পয়ার।[৯]

এ-সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের রচনাতে আমরা এরূপ অভিমত দেখতে পাই। প্রবোধচন্দ্র প্রথমে তাঁর 'স্বরবৃত্ত ছন্দ' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

> চৌদ্দ স্বরের স্বরবৃত্ত ছন্দের বিকৃতি থেকে চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে। ··অক্ষরবৃত্ত যে স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।···খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে বলতে গেলে বলা উচিত, বাংলা ছন্দ-প্রবাহিণীর প্রধান ধারা তিনটে নয়, দু'টো —মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। কিন্তু স্বরবৃত্ত থেকে এক নূতন ধারা উদ্‌গত হয়ে বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্য দান করেছে।[১০]

তার প্রায় ৪৫-বছর পরে, 'বিশেষভাবে' শ্রীরমেশচন্দ্র বসুর 'পয়ার ছন্দের উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধটি প'ড়ে, প্রবোধচন্দ্র তাঁর আগেকার সিদ্ধান্ত মূলগতভাবে পরিবর্তন ক'রে বলেছেন :

> আট-আট মাত্রার পাদাকুলক বা পজঝটিকাই রূপান্তরিত বা জন্মান্তরিত হ'য়ে আট-ছয় মাত্রার পয়ার রূপে আবির্ভূত হয়েছে।[১১]

প্রবোধচন্দ্র শেষ বয়সে বাংলা ছন্দ বিষয়ে যে-সকল গবেষণামূলক চিন্তাগর্ভ সন্দর্ভ রচনা করেছেন, প্রধানতঃ সেগুলির উপর ভিত্তি ক'রেই সম্প্রতি শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক 'বাঙলা ছন্দের বিবর্তন' নামে একখানি ৬৬-পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।[১২] মূলে গবেষণা নিবন্ধ হিসেবে বইটির নাম ছিল : 'বাঙলা ছন্দের বিবর্তনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রভাব'। তাঁকে এই বইটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি.এইচ.ডি. পদবী দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই গ্রন্থে আছে : বাঙলা ছন্দের বিবর্তনে উত্তর-ভারতীয় প্রাচীন প্রাকৃত ছন্দের প্রভাব "একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবার কোনো লক্ষণ আজও দেখা" না গেলেও, কেন "ক্রমে ক্ষীয়মান হয়ে" এল, তা "বিচার ক'রে দেখার প্রয়াস।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রবোধচন্দ্রের পরিণত বয়সের মতামত সমূহেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র; তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার কোনো মৌলিক রেখাপাতই এ-গ্রন্থে দেখা যায় না। তবে ভাষার ও ছন্দের বিকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু অবাস্তব তথ্যে ও এলোমেলো উক্তিতে আছে তাঁর স্বকীয়তা। তিনি বলেছেন—

> ভারতীয় প্রাকৃত ভাষার অর্বাচীন রূপকে বলা হয় অপভ্রংশ। আবার অপভ্রংশের রূপ পরিচিত হয়েছে অবহট্‌ঠ অর্থাৎ অপভ্রষ্ট নামে। নবম শতাব্দী থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে বঙ্গদেশ অবধি সমগ্র আর্যাবর্তে এই অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ প্রচলিত ছিল লোক-সাহিত্যের ভাষা-রূপে; সংস্কৃতের হীন বিকল্পভাবে।···
>
> তখনকার দিনের বাঙলাদেশে লোকমুখে প্রচলিত ভাষাকে আমরা বলতে পারি গৌড়ীয় বা বাঙলা-প্রাকৃত। বাঙলা-প্রাকৃতের উচ্চারণ-অনুসারে যে ছন্দোধারা উদ্ভূত হয়েছে তার আধুনিক পারিভাষিক নাম দলবৃত্ত (Syllabic) ছন্দ।···

> প্রাচীন প্রাকৃতের যে-ধারাকে কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ব'লে থাকি, বাঙলা-প্রাকৃতের প্রভাবে তা মিশ্রবৃত্তের (অক্ষরবৃত্তের) আকার নিচ্ছে, আর ষোলো মাত্রার পাদা-কুলকে ধীরে ধীরে চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত-দ্বিপদী-পয়ারে, রূপান্তরিত হচ্ছে। ...
>
> চর্যাগীতির ছন্দ মূলতঃ প্রাচীন প্রাকৃত ছন্দোরীতি অনুসারেই রচিত হয়েছিল। অপরপক্ষে বাঙলা-প্রাকৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতি প্রাচীন প্রাকৃতকে স্বীকার করে না। ফলে চর্যায় বাঙলা উচ্চারণ-অনুসারে আবৃত্তিতে কৃত্রিমতা ছিল। সেই কৃত্রিমতা স্বাভাবিক হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এসে।[১৩]

বাঙলা অক্ষরবৃত্তকে শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক বলেছেন: 'মিশ্রবৃত্ত'। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ১৩৩৯ বৈশাখে এ-ছন্দকে বলেন: 'যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত' এবং ১৩৩৯ ভাদ্রে তাঁর 'ছন্দ-সঙ্কট' প্রবন্ধে বলেন: "যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান-বিশেষে কোথাও বিশ্লিষ্ট কোথাও সংশ্লিষ্ট সে-ছন্দকে আমি বলছি 'যৌগিক ছন্দ', কেননা যুগ্মধ্বনির দু'রকম উচ্চারণের যোগে এ-ছন্দ গঠিত।" প্রবোধচন্দ্রের এই নামকরণ সম্বন্ধে শ্রীদিলীপ কুমার রায় তাঁর 'ছান্দসিকী' গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেন: "এই উদ্ভট নাম 'যৌগিক ছন্দ' শুন্‌বা মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় ধিক্ ধিক্ ক'রে ওঠে না কি?"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন অতঃপর তাঁর 'বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র' প্রবন্ধে অক্ষরবৃত্তের 'নূতন নাম' দেন 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক'।[১৪] এ-প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম:

> সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তে যুগ্ম-অযুগ্ম-নির্বিশেষে সর্বত্র 'অক্ষর' অর্থাৎ 'স্বর' এক ব্যষ্টি; কিন্তু বাংলা অক্ষরবৃত্তের যুগ্মধ্বনি শব্দমধ্যে স্বরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে সাধারণতঃ এক য়ুনিট। আর শব্দপ্রান্তে মাত্রাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে সর্বদা দুই য়ুনিট। বাঙ্গালার এই সুপ্রাচীন ছন্দটিতে শব্দমধ্যে 'স্বর' এবং শব্দপ্রান্তে 'মাত্রা' একক (য়ুনিট)-রূপে গণ্য, অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মিশ্র নিয়মে ইহার ছন্দসাম্য সিদ্ধ; এজন্য আমি ইহার নাম দিয়াছি 'মিশ্রবৃত্ত' ছন্দ।[১৫]

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন তার প্রায় ২৪-বছর পরে, ১৩৮৪ ভাদ্রে অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে বলেন:

> মিশ্ররীতিতে মাত্রা গণনা করা হয় ব'লে এই রীতিকে বলা যায় মিশ্রকলামাত্রক রীতি (mixed moric style)।
>
> পরিভাষা হিসাবে মিশ্রকলাবৃত্ত নামটা নির্দোষ। কিন্তু নিত্য ব্যবহারের পক্ষে কিছু দীর্ঘ। তাই 'কলা' কথাটা উহ্য রেখে মিশ্রকলাবৃত্তকে সংক্ষেপে বলা যায় মিশ্রবৃত্ত (mixed)।[১৬]

শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর অভিসন্দর্ভে 'অক্ষরবৃত্ত' অর্থে এই 'মিশ্রবৃত্ত' নামটিই সর্বত্র গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি এই ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, তারাপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ ছন্দঃবিশেষজ্ঞগণের মূল্যবান অভিমতসমূহ কেন মুকাবিলা করলেন না, একমাত্র প্রবোধচন্দ্রের অধুনাতন মতামতসমূহ অনুমোদন ক'রেই তাঁর একদেশদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন, তার হেতু অনুমান করা যাচ্ছে না।

অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন:

> চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা ক'রে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে, সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে-ভোলাবার ও ঘুম-পাড়াবার ছড়ায়।... ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে।[১৭]

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত তাঁর 'বাঙ্গালা ছন্দ' নামক নিবন্ধে বলেন :

> বাঙ্গালা ছন্দও মূলতঃ স্বরমাত্রিক, সন্দেহ নাই।[১৮]

প্রাকৃত পজ্ঝটিকা বা পাদাকুলক থেকে বাংলা অক্ষরবৃত্তের উদগম সম্বন্ধে পরম ছন্দজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায় বলেছেন :

> অনেকে বলেন, জয়দেবের—
>
> ৮ ৭
> বিকশিত সরসিজ ললিত মুখেন
> — —
> দহতি ন সা হিম কর কিরণেন
>
> এই ধরণের ছন্দ থেকেই বাংলা চতুর্দশমাত্রিক অক্ষরবৃত্তের উদ্ভব। কিন্তু এ-কথা সত্য নয়।[১৯]

ডক্টর শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য এম-এ, ডি-লিট, পি-আর-এস মহোদয় বহুবিধ যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বলেছেন :

> পাদাকুলক ছন্দ হইতে পয়ারোৎপত্তি হইতে পারে না। ···পাদাকুলক ছন্দ 'চৌপাঈ' মূর্তিতে পরিণত হইয়া হিন্দী ভাষায় আশ্রয় লইয়াছে; ইহা কিছুতেই বাঙ্গালার পয়ার ছন্দে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে পারে নাই। ধামালী ছন্দই বাঙ্গালার মধ্যযুগীয় পয়ার-ছন্দের জন্মদাতা।[২০]

শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক এ-সকল অভিমত খণ্ডনের কোনোরূপ চেষ্টা না ক'রে প্রবোধ চন্দ্রের শেষকালীন অভিমতে সায় দিয়ে বলেছেন যে, মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত "ষোলো মাত্রার পাদাকুলক ধীরে ধীরে চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছে।" এখানে তাঁর ব্যবহৃত "হচ্ছে" শব্দটি আমাদের মনে স্বভাবতঃই কৌতুক ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাঁর এই উক্তিতে আমরা কি বুঝবো যে, বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ গঠনে অপকৃষ্ট পাদাকুলকের কাজ বর্তমানেও চলমান রয়েছে? তা হ'লে প্রশ্ন ওঠে : পাদাকুলকের প্রভাবে বাংলা অক্ষরবৃত্তের আরও 'রূপান্তরিত' হওয়ার লক্ষণাদি তিনি নির্দেশ করলেন না কেন?

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা ভাষারই আদি মূল সংস্কৃত" মনে করতেন; তাই তাঁর পক্ষে বাঙলা ছন্দের আদিতম উৎস সন্ধানের জন্য সংস্কৃতের চবুতরায় বিচরণ অস্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তীকালে যাঁরা ভাবছেন যে, "মাগধী-প্রাকৃত আস্তে আস্তে বদ্‌লে বাঙ্গালাতে পরিণত" হয়েছে, অনুরূপভাবেই তাঁদের পক্ষে বাঙ্গালার আদি-ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদী মাগধী-প্রাকৃতের পাদাকুলক ও গাথা-ছন্দ থেকে উদ্‌গত ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা পয়ারের সঙ্গে ফারসী বয়েতের মিল সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীন শিথিল-প্রকৃতি ছড়া-ছন্দের বিবর্তিত রূপ সুসংহত অক্ষরবৃত্তের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে রম্যরচনার ভাষায় বলেছিলেন :

মধ্যযুগের ফার্সীনবিশ লিখিয়েরা ফার্সীর দেখাদেখি বাংলার 'যাইবে' 'পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দিষ্ট বা ভাঙটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পুরো ক'রে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন। চীনের সুন্দরীদের পায়ের মতন কেতাবী ভাষার ছন্দের গতি পয়ারের লোহার জুতোর মধ্যে অল্প বয়সে বাঁধা প'ড়ে একেবারে বেঁকে চুরে আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতার বা আভিজাত্যের লক্ষণ বলতেও কুণ্ঠিত হন নি; কিন্তু এ-সমস্তই বাইরে থেকে ফার্সী অলঙ্কারের একটা অবান্তর সূত্রের অনুসরণ করার ফল; ফার্সীর নজীরে মধ্যযুগের ছন্দকারেরা হসন্ত-শব্দকে খেয়াল-মাফিক স্বরান্ত বা হসন্ত করেছেন।[২১]

মধ্যযুগে ফারসী ছিল সরকারী ভাষা; উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা স্বভাবতঃই সে-ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বিদ্বজ্জনেরাও তার চর্চা করতেন। মান্দারণের সন্নিহিত আমাইপুরা গ্রামের বন্দিঘটী-বংশীয় বাড়ুয্যে বামুন শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র তাঁর 'চৈতন্য-মঙ্গল' কাব্যে সে-যুগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেন: "ব্রাহ্মণে রাখিবে দাঁড়ি পারস্য পড়িবে," "মস্‌নবী আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।" গৌড়ের স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলা-উদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) দুই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোতায়াল শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায় নদীয়া শহরে ও সিমুলিয়া গ্রামে, শাক্ত বনাম বৈষ্ণব এবং মুসলমান বনাম বৈষ্ণব, এ-সব পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে উন্মুক্ত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ ক'রে অবস্থান করতেন এবং এই দুই শুদ্ধ গোত্রীয় সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ অবসর সময়ে 'মস্‌নভী' পাঠ করতেন। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) কীর্তনীয়াদের কাছে তাঁরা 'মহাপাপী জগাই মাধাই' ব'লে নিন্দিত ছিলেন। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্য-মঙ্গলে' বলেছেন—

মস্‌নবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে॥

মওলানা জালালুদ্দীন রূমী (১২০৭-৭৩ খ্রী:)-রচিত 'মস্‌নভী' কাব্যকে বলা হয় ফারসী (পহ্লবী) ভাষার কুরআন; চৈতন্য-মঙ্গল পাঠে মনে হয় যে, চৈতন্য-যুগে জালালুদ্দীন রূমীর কাব্য ব্রাহ্মণেরাও ('দ্বিজবর') 'আবৃত্তি' করতেন। মওলানা রূমীর একটি সুপ্রসিদ্ধ ফারসী গজলের বয়েত—

V — — — | V — — — | V — — — | V — — — |
চি তদ্‌বীর আয়্ মুসলমানাঁ কি মন্ খূদ্‌রা নমীদানম্।
ন তর্‌সায়েম্ ন য়ীহুদেম্ ন গব্‌রম্ নহ্ মুসলমানম্॥[২২]

এটি 'হজয' ছন্দে বিরচিত।[২৩] এর প্রতি পংক্তিতে ৪+৪+৪+৪ সিলেবল। নিম্নে উদ্ধৃত করছি ৪+৪+৪+৩ সিলেবলের পংক্তিতে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর একটি লোকপ্রিয় বয়েত—

গন্‌জ বখ্‌শে ফৈজ্-ই-আলম মজ্‌হর-ই-নূর -ই-খুদা
নাকিস্‌মাঁরা পীর-ই-কামিল্ কামিলা-রা রহ্‌নুমা॥[২৪]

এ-সকল ফারসী গজলের ছন্দের প্রভাবে বাঙলা ভাষার তৎকালিক খণ্ডিত ও বিকৃত স্বরবৃত্ত ছন্দ তথা ধামালী-রীতি কিছুটা সুঠাম হ'তে থাকবে, এ স্বাভাবিক। কালক্রমে

সেই শিথিল স্বরবৃত্ত ছন্দের যুগ্মধ্বনি শব্দমধ্যে সচরাচর একব্যষ্টিক হ'য়ে এবং শব্দ প্রান্তে সর্বত্র দ্বিব্যষ্টিক হ'য়ে ধীরে ধীরে 'অক্ষরবৃত্তের' সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন স্বরবৃত্ত ধাপে ধাপে নেমে এসে শেষে কিরূপে বাংলা অক্ষরবৃত্ত পয়ারে পরিণত হয়েছে, তার একটি নিখুঁত উদাহরণ আধুনিক কাব্য থেকেই নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা ক'রে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম ;
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।···
দুনিয়ার এই মজ্‌লিষেতে এসেছিলেম গান শুন্‌তে ;···
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে রাগ-রাগিণীর জাল বুন্‌তে।···
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ার ভাটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরি ঢেউ।
সারা দিবস হেলে দোলে দেখে না ত কেউ।···
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে' থাকে ধরণীর পানে।

(রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, 'পত্র')

এর প্রথম শ্লোকে মওলানা রূমীর বয়েতের ধরনে ৪+৪+৪+৪ সিলেবল, দ্বিতীয় শ্লোকে মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর বয়েতের ধাঁচে ৪+৪+৪+৩ সিলেবল, তৃতীয় শ্লোকে ৪+৪+৪+২ সিলেবল ও চতুর্থ শ্লোকে ৪+৪+৪+১ সিলেবল আছে ; এবং পঞ্চম শ্লোকটি ১৪-অক্ষরের শালীন সুঠাম পয়ার। এই প্রক্রিয়ায় সুরেলা স্বরবৃত্তের "তুঙ্গভূমি থেকে সোপান বেয়ে এক পা এক পা ক'রে নেমে" এসেছে বাঙলা ভাষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে গদ্যাত্মক অভিজাত অক্ষরবৃত্ত পয়ার। এই অনন্য প্রক্রিয়া মধ্যযুগের অনেক কাহিনী-কাব্যেই দেখা যায়। যথা—

উহার হাতে রাঙ্গা শাঁখা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ি ঐ সে পূতের মা॥
বসন না দেয় বুকে, উদাম মাথার কেশ।
নগরে নগরে ফিরে বার-বণিতার বেশ॥
বারেক ঘরে সাধু এলে কহিব সন্ধান।
পাড়া পড়শী আয়্যা দুয়া হও পরমাণ॥
সই সঙ্গে লহনা যে করয়ে গঞ্জণা।
কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্লনা॥
পুত্রের সন্ধান পেয়ে ধরে তার পা'য়।
পুত্র কোথা ব'লে দেহ হইয়া সদয়॥
খুল্লনার বিনয় ত শুনিয়া লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত করিল রচনা॥

(লহনার সখী-সঙ্গে খুল্লনার কুৎসা-কীর্তন)

এই দৃষ্টান্তটিতে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, বাঙ্গালী প্রতিভার মৌলিক সৃষ্টি বাঙলা ভাষার আবহমান কালের স্বাভাবিক ছন্দ স্বরবৃত্ত শনৈঃ শনৈঃ "সংবৃত অক্ষরের (স্বরের) বাহুল্য কমাইয়া পয়ারে পরিণত হইয়াছে।" সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রমুখ প্রতিভাধর কবিদের দক্ষতা-গুণে বাংলা অক্ষরবৃত্ত পয়ার প্রায় সম্পূর্ণভাবে তার সুমার্জিত সাবলীল রূপ লাভ করে।

স্বরবৃত্তের চাল চতুঃস্বরিক; কিন্তু অক্ষরবৃত্ত পয়ারের পূর্ণ পদক্ষেপ অষ্টাক্ষরিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে বলেছেন—

আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।

আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দু'খানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে; কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুতঃ লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আট মাত্রার চাল।

নিম্নে ৮+৮+৮ অক্ষর-ভাগের ত্রিপদী-বন্ধের একটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।

মণি-মুকুতার ছান্দা　　উপরে টাঙ্গায় চান্দা
চৌদিকেতে দীপমালা।
(শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী, হর-গৌরীর বিবাহ)

নিম্নে ত্রিপদী শ্লোকের দৃষ্টান্ত তুলছি—

লাঠিয়াল মজবুত　　দারোয়ান রাজপুত
নিনাদ অদ্ভুত গাজে।
ভাট বন্দি কত কত　　শ্লোক পড়ে শত শত
ছন্দ নানা মত ভাজে॥
(টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দুলাল: ১১)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "ছয়-ছয়-আট মাত্রার ছন্দোবন্ধ 'লঘু-ত্রিপদী' নামে পরিচিত।"[২৫] তার প্রকৃত অর্থ, এই যে, ত্রিপদী-পংক্তির প্রথম দু'টি পদ থেকে দু'টি ক'রে অক্ষর হ্রাস পেলে ছন্দোবন্ধটা হয় লঘু ত্রিপদী (Short triplet)। লঘু-ত্রিপদী পংক্তির নজির—

হইয়া বিচেতা　　ধাইল প্রচেতা
বীরবর ধরি বান্ধে।
ব্রাহ্মণের জিউ রাখ　　ব্রাহ্মণের জিউ রাখ
বলিয়া প্রচেতা কান্দে॥
(শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী, দক্ষযজ্ঞভঙ্গ)

এর দ্বিতীয় পংক্তি ত্রিপদী, কিন্তু প্রথম পংক্তি লঘু-ত্রিপদী। নিম্নে লঘু-ত্রিপদী শ্লোকের নমুনা তুলছি—

বায়ুবেগ-গতি চলে দিবারাতি তুরগ বিদ্যুৎ-প্রায়।
ছয়মাস-পন্থ লঙ্ঘি মতিমন্ত উজানী-নগর পায়॥
(সাবিরিদ খান, বিদ্যাসুন্দর)

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি 'দীর্ঘত্রিপদী ছন্দ (Long triplet)' সম্বন্ধে বলেছেন: "ইহাতে সমুদায়ে ৫২টি অক্ষর থাকে; প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটী আটটী ও শেষার্ধে দশটি দশটি অক্ষর দেখা যায়।"[২৬] দীর্ঘ-ত্রিপদী পংক্তির নমুনা—

দুর্গার আঁটিয়া হাত কেমনে রান্ধিব ভাত
গলাএ মুণ্ডের মাল।
ডাকিয়া প্রবেস রণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভাল জানে
কাটা স্কন্ধে নাচে সর্বকাল॥
(শূন্য পুরাণ, অথ যজ্ঞ)

উপরোদ্ধৃত প্রথম পংক্তিটি ৮+৮+৮ অক্ষর-ভাগের ত্রিপদী; কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পাদে দুই অক্ষর বৃদ্ধি পেয়েছে ব'লে এই পংক্তিটির নামকরণ হয়েছে দীর্ঘ-ত্রিপদী। নিম্নে ছন্দোবন্ধের শ্লোক সংকলন করছি—

নদ নদী শূণ্যাকার ন ছিল ঝড় ঝঙ্কার
ন ছিল সাগর তিথ স্থান।
সংসারে ন ছিল কিছু সব হৈল তার পিছু
সভে মাত্র ছিল ভগবান॥
(শেখ জাহিদ, আদ্যপরিচয়)

নাথানিএল ব্রাসি হালহেড (১৭৫১-১৮৩০ খ্রী:) তাঁর A Grammar of the Benga Language (১৭৭৮) গ্রন্থের Of Versification অধ্যায়ে বলেছেন যে, ৭+৭+১০ অক্ষরে অন্য রকম ত্রিপদী রচিত হয় এবং তাতে একই আদর্শে যতি ও মিল থাকে। (Other treepodees have 7 syllables in each of internal pauses, with 10 in the concluding one; but are all formed upon the same principle.) নিম্নে তার দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

জন্মিল জগন্নাথে রাবণ যে বধিতে
দেবের করিতে পরিত্রাণ।
রচিল কীর্তিবাস মনের অভিলাষ
বন্দিয়া ত বাল্মীকি-পুরাণ॥
(আদ্য কাণ্ড, প্রথম খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

তিমির ঘনতরে সভয়ে বনচরে
ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া।
অপর সখী রসে রহিল পরবশে
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া॥
(ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, রসমঞ্জরী, 'উৎকণ্ঠিতা')

উপরের প্রথম উদাহরণের পংক্তিতে ৭+৭+১০ অক্ষর আছে। তার শেষ পাদ ৬+৪ অক্ষর অথবা ৪+৬ অক্ষরে গঠিত। দ্বিতীয় উদাহরণের পংক্তিতে আছে ৭+৭+৭+৩ অক্ষর; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর 'বাসবদত্তা' কাব্যে এই ছন্দোবন্ধকে বলেছেন 'ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী'।

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন: "ত্রিপদীর উদ্ভব পয়ারের কাঠামো হইতেই।"[২৭] কিন্তু শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক বলেন: "ত্রিপদী-বন্ধ প্রাকৃত ছন্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, দোহা এবং মরহট্টা ছন্দই হ'ল এর মূল উৎস।" তিনি "দোহা ছন্দের সার্থক অনুকরণ চর্যাপদে" পেয়েছেন এই (৪৬ পৃষ্ঠা)—

v v— — —| — —v —‖
তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে
vvv vvv vv| —vv
অণহ কসণ ঘন গাজই।
— v v —v| v—vv —‖
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে
vv —vv v—v|—vv
সঅ মণ্ডল সএল ভাজই॥ (চর্যা : ১৬)

যদি পংক্তির প্রথম পাদে ত্রয়োদশ মাত্রা থাকে এবং অন্ত্যবর্ণ লঘু হয় এবং পরে একাদশ মাত্রা থাকে, তা হ'লে তাকে দ্বিরাবৃত্তি ক'রে দোহা বা 'দোহড়িকা' ছন্দ হয়।[২৮] কিন্তু উপর্যুক্ত শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ১৫+১২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৪+১৪ মাত্রা রয়েছে; সুতরাং এই দৃষ্টান্তটিকে কোনো ক্রমেই 'দোহা' বলা চলে না। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে ১৩+১১ মাত্রার দোহা ছন্দের নমুনা—

— — —v vvvv —‖ v— v — — v vv
মাআজাল পসরিউ রে বধেলি মায়া-হরিণি
(চর্যা : ২৩)
—v —v v —vv —‖ v —v — — —v
এথু জাই ণ আবই রে ণ তংহি ভাবাভাব
(চর্যা : ৪৩)

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় "প্রাকৃতের ত্রিপদী বা মরহট্টার অনুস্মৃতি" দেখাতে গিয়ে[২৯] দারিকপাদের রচিত ৩৪-সংখ্যক চর্যার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন ৮+৮+৮+৪ মাত্রার ছন্দ ব'লে—

— — — — — —‖ — — — — — —v v— —
কিন্তো তন্তে কিন্তো মন্তে কিন্তো রে ঝাণ বখানে।
vvv—v v v— vv‖ — — v—v vvv v— —
অপইঠান ০ মহা সুহ লীলেঁ দুলকৃখ পরম নিবাণেঁ॥

এর প্রথম পংক্তিতে ১২+১৮=৩০ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে (প্রথম পাদের অন্ত্যে এক মাত্রার ফাঁক ধ'রে) ১২+১৫=২৭ মাত্রা রয়েছে। সুতরাং এটি সাধারণ আর্যা ছন্দ। এটিকে ৮+৮+৮+৪ মাত্রার জয়দেবী গাথা-ছন্দ অথবা ৪+৪+৪+৪+৪+৪+৩=২৭ মাত্রার মরহট্ঠা ছন্দ ব'লে কদাচ চিহ্নিত করা চলে না। তবে কোনও কোনও পণ্ডিতের ধারণা যে, গাথা, মরহট্ঠা, চউবোলা, পউমাবত্তী প্রভৃতি অপভ্রংশ ছন্দের মূল উৎস আর্যা ছন্দ,—৯১-প্রকার আর্যা-ছন্দের নানা আকারের পদ ও পংক্তি ভেঙেই তাদের উদ্গম হয়েছে। শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক উপরোক্ত ৩৪-সংখ্যক চর্যার আর্যা-শ্লোকটির পরে রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' থেকে সংস্কৃত রীতির ৮+৮+৮+৪ মাত্রার দু'টি চরণ এবং 'প্রবাহিণী' কাব্য থেকে বাংলা রীতির ৮+৮+১০ মাত্রা-ভাগের দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন যে, প্রাচীন প্রাকৃত রীতি "সংকুচিত হয়ে ৮+৮+১০ মাত্রায় রূপান্তরিত হ'য়ে" বাংলা দীর্ঘ-ত্রিপদীর উদ্ভব ঘটিয়েছে।

অত্যাধুনিক কালে প্রাচীন প্রাকৃত রীতির ৮+৮+৮+৪ মাত্রা-ভাগের অনুসরণে বাংলা রীতির ৮+৮+৮+৪ মাত্রা-ভাগে সংরচিত মাত্র তিনটি কবিতা আমার নজরে পড়েছে। সেগুলি থেকে নিম্নে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

নাচে নাচে ঢেউ-তোলা নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
(প্রেমেন্দ্র মিত্র, সম্রাট, 'নীলকণ্ঠ')

দোলে ঐ অম্বর নীলে টইটম্বর মাঝে তার মন্দার নাচে ঐ;
তন্ময় আঁখি মুদি' মথি' মরণাম্বুধি তাণ্ডবে মাতে মর-পাঞ্জরী।
(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মরুমায়া, 'শিবতাণ্ডব')

রূপার ওড়না কার পড়েছে বনের পথে হেথা-হোথা ছোট-খাটো টুক্‌রায়;
আব্‌ছা আলোক দেখে চম্‌কিয়ে বোকা পাখী থেকে থেকে ওই শোন্ ডুক্‌রায়।···
ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জোছনা ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে;
অদূরে গুহার মুখে সিংহের গর্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
(সজনীকান্ত দাস, ভাব ও ছন্দ, 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' : ১৭)

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণটি নিখুঁত। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'মরণাঞ্জয়ী' শব্দে 'অস্থানে যতিখণ্ডন' নিঃসন্দেহে বাক্‌রীতিলঙ্ঘক ও শ্রুতিপীড়াদায়ক হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণের তৃতীয় পংক্তিতে 'ডুবে যাবে জোছনা' পদটি সপ্তমাত্রক হ'য়ে ছন্দঃপতন ঘটিয়েছে; উপরন্তু তার প্রান্তিক পদ চতুর্মাত্রক স্থলে ত্রিমাত্রক হওয়ায় ছন্দঃসঙ্গীতে ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে আসল প্রশ্ন এই যে, প্রাকৃত গাথা-ছন্দের স্বাভাবিক অনুসরণে বাংলা মাত্রাবৃত্ত রীতিতে ৮+৮+৮+৪ মাত্রার কবিতা রচনার দৃষ্টান্তই যে-স্থলে এত দুর্লভ ও ছন্দদুষ্ট, সে-স্থলে তার কুক্ষি থেকেই ৮+৮+১০ অক্ষর-ভাগের দীর্ঘত্রিপদী-বন্ধের উদ্ভব কল্পনা করা সনাতনী মনোভাবের গোয়ার্তুমি ছাড়া আর কী হতে পারে?

বাঙলা প্রাচীন কাহিনী-কাব্যের মাঝে-মধ্যে দেখা যায় ৮+৬ অক্ষরের পয়ার প্রসারিত হয়ে ৮+৮ অক্ষরের পূর্ণপয়ার ও ৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘপয়ারের আকৃতি লাভ করেছে। তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

সাগরের জলজন্তু যখন ধরিতে মন সরে।
তিন ভাগ সাগরের জল আস্বাদন করে॥
(কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', অরণ্য কাণ্ড)[৩০]

চন্দনের কাঠ জদি আনিল আপুনি হনুমান।
চন্দন ঘষিব ধর্ম দেবতার বিদ্যমান॥
(রামাঞি পণ্ডিত, শূণ্যপুরাণ, অথ (টীকা-পাবন)

হেঁতালের বাড়ি দিল তাতে ব্যথা পাইলাম বড়।
জালুয়া মণ্ডপে গিয়া কাঁকালী কৈলাম দড়॥
(বিজয় গুপ্ত, পদ্মপুরাণ)

ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে প্রসারিত হ'য়ে দীর্ঘপয়ার ৮+৮+৬ অক্ষরের অতি-দীর্ঘ-পয়ার এবং ৮+৮+৮ অক্ষরের ত্রিপদী ৮+৮+৮+৮ অক্ষরের চৌপদী হয়েছে। চৌপদীর দৃষ্টান্ত—

দয়া করো মোর প্রতি　　আমি অতি মূঢ়মতি,
করযোড়ে করি স্তুতি　　সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন,　　বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন　　সারাৎসার পরাৎপর॥
(টেকচাঁদ ঠাকুর, গীতাঙ্কুর : ১)

এখানে প্রতি পংক্তির ৮ম, ১৬শ ও ২৪শ অক্ষরে পদান্ত-মিল এবং দুই পংক্তির শেষে পংক্তি-মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (ফাল্গুন, ১২৮৭) নাটকের গীতাবলীতে এই ছন্দোবন্ধ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) তাঁর 'নিভৃত নিবাস' (১২৮৫ সন) কাব্যের নবম সর্গে এই ছন্দোবন্ধকে বলেছেন : 'বহুপদী-দীর্ঘরেখা ছন্দ' ; কিন্তু তাতে পদান্ত-মিল নেই,—শুধু পংক্তিমিল আছে।

দীর্ঘ-ত্রিপদীতে থাকে ৮+৮+১০ অক্ষর-ভাগের তিনটি পদ। অতএব পয়ার-পংক্তিতে ৮+৮+৮+১০ অক্ষর-ভাগের চারটি পদ থাকলে তার নামকরণ হবে দীর্ঘ-চৌপদী। তার উদাহরণ—

শুন শুন শুন সখী　　যার তরে হৈলুঁ দুখী
প্রথম স্বপ্নেত দেখি　　হৃদয় অন্তরে কামহতা।
এ তিন বরিখ ধরি　　রজনী বসিআ ঝুরি
বিরহ-অনলে পুড়ি,　　কাহাতে কহিমু এহি কথা॥
(শাহ্ মোহাম্মদ সগীর, ইছপ-জলিখা কাব্য)

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণের পুঁথিতে এবং কবীন্দ্র সঞ্জয় ও পরমেশ্বরের মহাভারতের পুঁথিতে দীর্ঘ-ত্রিপদীর নাম 'লাচাড়ি'। কবি তাঁর কাব্যে দীর্ঘ-চৌপদীর নামকরণ করেছেন 'লাচারি লগ্নিকা ছন্দ'। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অভিনব ছন্দোবন্ধ কোন্ কাব্যে অথবা আদৌ আর কোনও কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধানীয়।

সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দ বাংলা কাব্যে ব্যবহারের বিষয় শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর পুস্তকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করেছেন। সাবিরিদ খান, নরহরি চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, ভুবনমোহন রায়চৌধুরী, বলদেব পালিত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহেশচন্দ্র শর্মা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হরগোবিন্দ লস্কর-চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায়, সজনীকান্ত দাস ও নিশিকান্ত রায়চৌধুরী সংস্কৃত বর্ণচ্ছন্দে কিছু কবিতা ও গান রচনা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'সদ্ভাব-শতক' (১৮৬১) কাব্যে 'গর্বিত রাজার প্রতি' শীর্ষক কবিতার দু'টি শ্লোক রচনা করেন সাধারণ আর্যা ছন্দে ; (আর্যার পংক্তির প্রথম পাদে ৪+৪+৪ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ৪+৪+৪+৪+২ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ৪+৪+৪ মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে ৪+৪+১+৪+২ মাত্রা থাকে) কিন্তু তাতে গণঃগঠন সর্বত্র যথাবিধি হয়নি, উপরন্তু কোনো পাদে মাত্রাধিক্য এবং কোনো পাদে মাত্রাল্পতা ঘটেছে।[৩১] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বিদায়-আরতি' কাব্যে 'দুর্ভিক্ষের গান' নামে সংস্কৃত মাত্রা-ছন্দে একটি গীতিকবিতা রচনা করেন। সেটিও দুর্বল রচনা ও ছন্দোদুষ্ট।[৩২] তবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সর্বপ্রধান কীর্তি এই যে, তিনি কিছুসংখ্যক সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত

ও আরবী ছন্দের অনুবাদ করেন 'বুলবুল-গুলজার পদ্ধতি' (স্বরমাত্রাবৃত্ত) ও 'বিমান-বিহার পদ্ধতি' (প্রস্বরমাত্রিক) উদ্ভাবন ক'রে। এই দু'টি নূতন ছন্দরীতি তাঁরই দৈবী প্রতিভার অসামান্য সৃষ্টি। তাঁর প্রবর্তিত প্রাস্বরিক রীতি অনুসরণ ক'রে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায়, সুনির্মল বসু, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি বহু সুখপাঠ্য কবিতা সংরচন করেছেন। শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী ও অনুষ্টুপ্ ছন্দের ছয়টি পংক্তি তুলে দিয়ে মন্তব্য করেছেন: "দেখা যাচ্ছে বাংলার হাস্যরস সৃষ্টিতে সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার নিষ্ফল নয়; কিন্তু অন্যত্র এই ছন্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।" কিন্তু 'ফারসী-নবিশ' ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত (আরবী মুতাকারিব), তূণক (ইংরেজী ট্রোকি) ও তোটক (ইংরেজী আনাপেস্ট) ছন্দে রচিত খণ্ডকবিতাত্রয় কি 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ' হয়েছে? নিম্নে সংস্কৃত 'গজগতিঃ' ও 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের দু'টি নমুনা তুলছি—

VVV—| VVV— | VV V— | VV V—|
ঘনঘটা দরশনে যত সুখী হয় শিখী.
সুমিলনে হরি-সনে তত সুখী শশিমুখী।
স্মর-বশে দুই জনে নব রসে মজি' রহে;
অনিমিষে দু'নয়নে জলকণা ঘন বহে।
(বলদেব পালিত, ললিত কবিতাবলী)

—— —— | VVV V V— | —V— — V——|
পুষ্পে পুষ্পে মধুপ-নিকরে পেখিয়া সে বরাঙ্গী
সে সম্ভাষে ললিত বচনে ষট্‌পদে দূত মানি';
ঝাঁকে ঝাঁকে সুমুখ কমলে কাঁপিছে ভৃঙ্গমালা,
ত্রস্তা রাধা উছল বসনে বার বারে নিবারে।
(দেবেন্দ্রনাথ সেন, অপূর্ব মেঘদূত কাব্য)

উপরোদ্ধৃত দু'টি দৃষ্টান্তে সংস্কৃত বর্ণচ্ছন্দ 'হাস্যরস' সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় নি, এবং সুমধুর আদি রস সৃষ্টি 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ' হয়নি। প্রকৃত কথা এই যে, প্রতিভাধর কবির হাতে যে কোনও ছন্দে যে কোনও রস সৃষ্টি হ'তে পারে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, সংস্কৃত মাত্রা-ছন্দে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবিগণ কয়েকটি অমর গীতিকবিতা রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউই বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গান রচনার চেষ্টা করেন নি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'ছন্দিতা' ও 'ছন্দসী' নামক দু'টি গীতি-আলেখ্যে সংস্কৃত স্বাগতা, প্রিয়া, মন্দাকিণী, মণিমালা, মালিণী, মন্দাক্রান্তা, বসন্ততিলক, তনুমধ্যা প্রভৃতি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে অপূর্ব সঙ্গীত রচনা ক'রে গেছেন।[৩৩] নিম্নে 'স্বাগতা' ছন্দে রচিত নজরুলের একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উদ্ধৃত করছি।[৩৪]

—V— VVV—VV — —
স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা
ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্ণা।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন কুঞ্জে
যেন ও চরণ- নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মুরলি শোভিত হাতে
এস গো বিরহ- নীরস রাতে
হে প্রিয়া করিব প্রাণ অর্পণা॥
(শেষ সওগাত, ছন্দিতা)

এর বাণী ছন্দের বিচারে যেমন নিখুঁত, সুরের বিচারেও তেমনই অনবদ্য। অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ভিন্ন কোনো কবির পক্ষে এরূপ অভাবনীয় সৃষ্টি সম্ভবপর নয়।

কিন্তু নজরুলের এ-প্রকার নব-প্রবর্তিত ছন্দকৃতির প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতে অনেক ছান্দসিকই অধুনা আশানুরূপ আগ্রহ বোধ করেন না। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, 'কমরেড', 'কস্‌রৎ', 'দরকার', 'কলকাতা', 'মাসতুতো', 'ঝুম্‌ঝুমি' প্রভৃতিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তিন মাত্রা ব'লে গণ্য করেছেন; শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক বলেছেন যে, "তাঁর (সুভাষের) এই প্রচেষ্টাকে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র 'বাংলা ছন্দে নূতন সম্ভাবনা' প্রবন্ধে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।" কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্বেই এরূপ প্রয়োগ অনেক খ্যাতনামা কবি সার্থকভাবে ক'রে গেছেন। নিম্নে তার দশটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি---

হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনার পার।
আতি বড় শ্রম পাঁআ নাম্বায়িল পসার॥
(বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভারখণ্ড)

রাম-কৃষ্ণ ল'য়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে।
দাণ্ডাইয়া যুবতীগণ কাঁদে সেই পথে॥
(মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ঊনচত্বারিশ গীত)

পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান।
মৃজাপুর ঘাটে ডিঙ্গা করিল চাপান॥
(শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধনপতির নৌকারোহণ···)

মসজিদ পুষ্করণী দিলা বহুল বিধান।
নানা দেশে গেল তাঁর প্রতিষ্ঠা বাখান॥
(দৌলত কাজী, সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী)

যত হিন্দু নৃপগণ হ'য়ে এক ঠাঁই
সুলতান শাহাকে সবে দিলেক খেদাই।
(আলাওল, পদ্মাবতী কাব্য)

ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবত আর কানগোই তার॥
(ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন)

নিরখি নন্দিনী-মুখ　　পুরজন পরম সুখ
প্রেমধারা নীরদ-নয়নে।
কদম্ব-কুসুম-অণু　　পুলকে পূরিল তনু,
আহ্লাদ-তরঙ্গ বহে মনে॥
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সারদা-মঙ্গল)

বিরাজে অপর পারে এমদাদ উদ্যান,
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় মন।
(দীনবন্ধু মিত্র, সুরধুনী কাব্য, ৩য় সর্গ)

জ্বলিল চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
(হেমচন্দ্র, বৃত্র-সংহার, ত্রয়োদশ সর্গ)

কহিলেন গুরু, 'বৎস, হয়ো না অধীর,
বলি যে দু'একটি কথা, শুন হ'য়ে স্থির।'
(যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃথ্বীরাজ কাব্য)

এখানে 'নাম্বায়িল', 'দাণ্ডাইয়া', 'পাড়পুর', 'মসজিদ', 'সুলতান', 'নহবত', 'পুরজন', 'এমদাদ', 'গুগ্‌গুল', ও 'দু'একটি', শব্দে অক্ষর-সংখ্যা চার হ'লেও তিন ব্যষ্টি রূপে গণ্য হয়েছে। সুতরাং শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় এ-ব্যাপারে কোনও নূতন বিধান প্রবর্তন করেন নি এবং 'অভিনন্দন' লাভের যোগ্য কোনও কাজও করেন নি।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত ১৩৪৭ পৌষের 'কবিতা' পত্রিকায় শ্রীসুভাষের 'পদাতিক' কাব্যের সুদীর্ঘ সমালোচনায় সেই কাব্যের 'কিংবদন্তী' নামক ১১-মাত্রার ৮-পংক্তির ক্ষুদ্রকায় "কবিতাটির ছন্দের প্রতি ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ" করেন। এই একাবলী-বন্ধের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে[৩৫] নজরুলের সুপরিচিত কবিতা—

চাই না ধর্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম,
আমাদের কাছে; শুধু হালাল
দুশ্‌মন-খুন লাল-সে-লাল।
(ভাঙার গান, 'দুঃশাসনের রক্তপান')

শ্রীসুভাষের ৮-পংক্তির 'কিংবদন্তী' কবিতার দু'টি পংক্তিতে অস্থানে যতিখণ্ডন হ'য়ে "বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রাস্বরিক রীতি বা বাক্‌ভঙ্গী লঙ্ঘিত হয়েছে, এ-রকম লঙ্ঘন ছন্দের উৎকর্ষ সাধনের অনুকূল নয়," এবং এই 'রীতি-লঙ্ঘন' শ্রীপ্রবোধচন্দ্রের "কানে একটু খুঁতের মতোই বোধ হয়েছে।"[৩৬]

শ্রীসুভাষের 'চীন : ১৯৩৮' শীর্ষক ৬+৬+৬ মাত্রা-যোগে নির্মিত কবিতাটির উল্লেখ প্রবোধচন্দ্র করেছেন। এই নূতন ছন্দোবন্ধের প্রবর্তকও নজরুল। উদাহরণ দেখুন—

একটি পশম ভিজাবার মতো সমুদ্র-জল
র'বে যতদিন, ততদিন র'বে শর্ত অটল।
ফেলি' হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি' ভাই ভাই
এই সে-শর্তে হলো প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সবাই।
(মরু ভাস্কর, 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ')

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকুট' কাব্যের 'দীক্ষিতের গান' এবং শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা : 'প্রস্তুত' ও 'বিভীষণের প্রতি', এই ষন্মাত্রক ত্রিপর্বিক ছন্দোবন্ধেই বিরচিত।

শ্রীসুভাষের 'পদাতিক' কাব্যের 'রোমাণ্টিক', 'বিরোধ' ও 'আদর্শ' ৬+৬+-৩ মাত্রা-ভাগে সংরচিত। প্রবোধচন্দ্র 'রোমাণ্টিক' কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন যে, যেহেতু তার "প্রতি পংক্তিরই শেষ পর্বের মাত্রা-পরিমাণ" তিন, অতএব "সুভাষ এ-বিষয়ে অধিকতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।"[৩৭] এই ছন্দোবন্ধে নজরুলের রচনা—

ভুলিয়া যাই হে　　যবে সুখ-দিনে　　তোমারে,
স্মরণ করায়ে　　দাও আঘাতের　　মাঝারে।

এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় মাত্রাবৃত্তের এই ছন্দোবন্ধে কবিতা প্রণয়নে সমধিক প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন।

৬+৬+২ মাত্রা-যোগে নজরুলের রচনা—

নচিকেতা-সম　　আমরা　　মৃত্যুপুরী
বারে বারে যাই　　বারে বারে আসি ঘুরি'।
(প্রলয়-শিখা, 'বিংশ শতাব্দী')

নজরুলের 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের 'পরভৃত' সর্গটি এই ছন্দোবন্ধেই বিরচিত। তাঁর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের গান: "হার-মানা-হার পরাবো তোমার গলে" (গীতিমাল্য: ২৪); সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'করবী' (ফুলের ফসল), 'ক্ষুদ্র গাথা' (তীর্থরেণু) প্রভৃতি এই ছন্দো-বন্ধেই রচিত হয়েছিল। অত্যাধুনিক কালে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পদাতিক' কাব্যের 'সকলের গান', 'পদাতিক: ১—২', এবং শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যের 'অনুভব', 'হে মহাজীবন' প্রভৃতি কবিতা এই পদ্ধতিতেই প্রণয়ন করেছেন।

৬+৬+৪ মাত্রা-যোগে নজরুলের রচনা—

আশ্রয়হারা　　সম্বলহীন　　জনগণে
সে দেখিবে চির-আপন করিয়া কায়-মনে।
(মরু-ভাস্কর, 'সর্বহারা')

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যের 'কানামাছির গান' ও 'ঘরে-বাইরে' এবং 'চিরকুট' কাব্যের 'কাব্যজিজ্ঞাসা: ৪' এই ছন্দোবন্ধেরই অনুসৃতি।

মাত্রাবৃত্ত রীতির নানা নূতন ছন্দোবন্ধে কবিতা সংরচিত হ'লে বাংলা ছন্দের বিচিত্র সম্ভাবনার পথ প্রসারিত হ'বে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই নূতন সম্ভাবনার দ্বার সর্বাধিক। উন্মোচিত হ'তে পারে মাত্রাবৃত্তের পয়ার ও দীর্ঘপয়ার রচনার প্রয়াস বৃদ্ধি পেলে। অমিল স্বরবৃত্ত প্রবহমান পয়ারে মহাকাব্য রচিত হলে 'গাম্ভীর্যের ত্রুটি' ঘটবে 'এ-কথা রবীন্দ্রনাথ মানেন না।[৩৮] কিন্তু আমার ধারণা যে, মাত্রাবৃত্ত রীতির পয়ার ও দীর্ঘপয়ার-বন্ধে মহাকাব্য, নাট্যকাব্য, খণ্ডকবিতা ও সনেট সংরচিত হলে তাতে সার্থকতা লাভের পথ অধিকতর প্রশস্ত হবে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের (প্রথম সংস্করণের) 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত পয়ারের একটি অনবদ্য নিদর্শন। নিম্নে মাত্রাবৃত্ত দীর্ঘ-পয়ারের একটি সাধারণ নমুনা সংকলন করছি—

আমার বন্ধ্যা নিশি　　পোহাইল　　দূর গিরিশিরে,
একটি প্রদীপ-শিখা　　নিভে গেল　　গভীর তিমিরে।
ফুলের বাসনা আজ　　ফুরাইল　　ভরা যৌবনে,
একটি নীরব উষা　　দাঁড়াইয়া　　আছে আনমনে।
আমার সোনালি সাধ　　ডুবে গেল　　ঝড়ের আঁধারে,
রাতের কপোতী আজ　　আশ্রয়　　যাচে মোর দ্বারে।
(বন্দে আলী মিয়া, 'নূতন স্বপ্ন')

সাম্প্রতিক কালে অক্ষরবৃত্তে কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহারের যে-প্রশ্ন ওঠেছে এবং কথ্য ক্রিয়াপদের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি এক ব্যষ্টি অথবা দুই ব্যষ্টি রূপে গণনার যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান এই মাত্রাবৃত্ত প্রক্রিয়ায় অবলীলাক্রমেই হয়ে যায়। সাধু ক্রিয়াপদ 'আসিবে' এবং কথ্য ক্রিয়াপদ 'আস্‌বে' এই রীতিতে সমমূল্য। সুতরাং যাঁরা কেবলমাত্র কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাঁরা এই রীতিতে অবিচল স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন।

অক্ষরবৃত্তে দেশজ শব্দের মধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি এক ব্যষ্টি অথবা বিকল্পে দুই ব্যষ্টি গণনার বিষয়ে এই আলোচনায় পূর্বে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। অক্ষরবৃত্তে শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ এক ব্যষ্টি রূপেই গণ্য হয়ে থাকে। তার তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

পুরীর ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যা-রূপে আলো করে সব পাতালপুরী ।।
(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)

ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।
(বিহারীলাল চক্রবর্তী, বন্ধুবিয়োগ, ১ম সর্গ)

পুকুরের পাড়ে
সবুজের আল্‌পনায় রং দিয়ে লেপে।
(রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনে : ১৯)

এখানে 'পাতালপুরী', 'গামছাখানি', ও 'আল্‌পনায়' শব্দ পাঁচ অক্ষরে গঠিত হলেও তাদের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি যথাক্রমে 'তাল', 'গাম' ও 'আল্' এক ব্যষ্টি রূপে গণ্য হয়ে চতুরক্ষরের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশজ শব্দের ক্ষেত্রে সর্বত্র এই নিয়ম পালন করেন নি। যেমন—

স্যাৎসাতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্চ্ছায় অসাড়।...
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নেই।
(পরিশেষ, 'বাঁশি')

এখানে 'স্যাৎসাতে', 'ঘরটাতে', 'আকবর' ও 'বাদশার' শব্দ প্রত্যেকে চারি ব্যষ্টি রূপে গণ্য। কিন্তু শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'আকবর' ও 'বাদশার' শব্দ তিন ব্যষ্টি রূপে গণ্য করার পক্ষপাতী।[৩৯] শ্রীশঙ্খ ঘোষ দেখেছেন 'আকবর বাদশার সঙ্গে' পদটির 'অষ্ট-মাত্রিক' ব্যবহার।[৪০] শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে, 'আকবর শব্দের 'ক' ও 'ব' অক্ষর সংযুক্ত ক রে 'ক্ক' রূপে লেখা 'রীতিবিরুদ্ধ নয় বটে'; তাই 'আকবর' অর্থাৎ 'আক্কর' তিন ব্যষ্টি রূপে গণ্য হতে পারে; কিন্তু 'বাদশার' শব্দের 'দ' ও 'শ' মিলিয়ে যুক্তাক্ষর সৃষ্টি করবার 'রীতি নেই'; তাই 'দ'য়ে 'শ'য়ে 'অসবর্ণ মিলন' ঘটিয়ে, অর্থাৎ 'বাদশার' শব্দকে তিন ব্যষ্টি ধ'রে, "রবীন্দ্রনাথই এই দুঃসাহসিক মিলনের প্রথম পুরোহিত" হয়েছেন। শ্রীশঙ্খ ঘোষও এক্ষেত্রে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের 'অজানিত দুঃসাহস'। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের বহু আগেই অনেকেই এরূপ 'অসম-সাহসে' অক্ষরবৃত্তে এ-ধরণের শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনির একব্যষ্টিক মূল্য দিয়েছেন। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষার্থী-তোষ ছন্দপুস্তকে 'কবিকঙ্কণ' নাম নিয়ে পদ্য বানিয়েছেন; তাই এ-প্রসঙ্গে 'শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী' থেকেই নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা বন্দিনু বিধিমতে।
তমলুকের বর্গভীমা বন্দো মুঞি মাথে॥···
দশঘরার বিশালাক্ষী হও সুপ্রসন্ন।
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ॥
(দিগ্‌বন্দনা)

ঘন-কাটী খর-জ্বালে রান্ধিবে ডালঘণ্ট।
তবে সে পূরিবে মোর উদর আকণ্ঠ॥
(হর-পার্বতীর কোন্দল)

ততোধিক পোড়ে-প্রাণ বাঘছালের বাসে॥
(গৌরীর খেদ)

নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বাম দিগে থুয়া।
দক্ষিণেতে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া॥
(সাধুর মগরায় গমন)

এখানে 'ক্ষীরগ্রামের', 'তমলুকের', 'দশঘরার', 'বাঘছালের', 'নাচনঘাগাছা' ও 'বৈষ্ণব-ঘাটা' প্রত্যেকে চারি ব্যষ্টি রূপে এবং 'ডালঘণ্ট' তিন ব্যষ্টি রূপে গণ্য হয়ে ছন্দ পরিমিত করেছে। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বলেছেন: "ছন্দ সম্পর্কে আমার অল্প-বিস্তর কৌতূহল আছে, পড়াশোনা একেবারেই নেই।"[৪১] কিন্তু তিনি 'কহে কবিকংকণ' ব'লে ভণিতা করলেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' অকাব্যখানি (১৫৭৪-১৬০৪ খ্রীঃ) 'একেবারেই' বোধ হয় প'ড়ে দেখেননি; তাই এভাবে ব্যষ্টিগণনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে 'প্রথম পুরোহিত' বলতে তাঁর বাঁধে নি। বাংলা কাব্যগুলো অভিনিবেশ-সহকারে না প'ড়ে ছন্দ বিষয়ে আজব মন্তব্য করতে গেলে এরূপ বিভ্রান্তির শিকারই হতে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'আকবর বাদশার সঙ্গে' পদটি দশ ব্যষ্টি ধ'রেই 'বাঁশি' কবিতাটি রচনা করেন। তাতে 'স্যাৎসাতে ঘরটাতে ঢুকে' পদটিও দশ ব্যষ্টি। যেমন, 'ব্যাঙগমা মেলে দিল পাখা' দশ ব্যষ্টি, এবং 'জান্‌লা খুল্‌তে সেটা ডালে ঠেকে গেল" পংক্তিটি ৮+৬ ব্যষ্টির পয়ার। প্রসঙ্গতঃ এই রীতির আর তিনটি পঙক্তি তুলছি—

ফল্‌সা চাল্‌তা ছিল, ছিল সার-বাঁধা
সুপারির গাছ।···
ইদিকে ছিলেন বাবা ইনকম-ট্যাক্সো-কালেক্টর।
(পরিশেষ, 'উন্নতি')

অক্ষরবৃত্তের সাধারণ রীতিতে এখানে 'ফল্‌সা' ও 'চাল্‌তা' প্রত্যেকে দুই ব্যষ্টি ব'লে গণ্য ব'লে পংক্তিত্রয়ের আকৃতি হ'বে এরূপ ৮+৪+৬=১৮ অক্ষরের দু'টি দীর্ঘপয়ার-পংক্তি—

ফল্‌সা চাল্‌তা ছিল, ছিল সার-বাঁধা সুপারির গাছ।
ইদিকে ছিলেন বাবা ইনকম- ট্যাক্সো-কালেক্টর।

এবং নীরেন্দ্রনাথের ছন্দোব্যাখ্যা মানলে 'বাঁশি' কবিতা থেকে পূর্বোদ্ধৃত প্রথম দু'টি পংক্তি হবে একটি ৮+৪+৬ অক্ষরের দীর্ঘপয়ার-পংক্তি এবং শেষের দু'টি পংক্তি হবে ৮+৮+৬ অক্ষরের একটি অতি-দীর্ঘ পয়ার-পংক্তি। যথা—

স্যাৎসাতে ঘরটাতে ঢুকে কলে-পড়া জন্তুর মতন···
আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোনো ভেদ নেই।

তাতে দু'টি কবিতার ছন্দোবন্ধেরই শুধু পরিবর্তন ঘটে না, তাদের ছন্দঃসঙ্গীতও বিঘ্নিত হয়। কবি যে-মেজাজে ও যে-রীতিতে ধ্বনিবিন্যাস ক'রে কবিতা নির্মাণ করেন, তা যথাযথ অনুধাবন ক'রে তার ছন্দ-নিরূপণই ছন্দোবৈয়াকরণের কর্তব্য; সেখানে কোনো খেয়ালী বিশ্লেষণের পরিচয় বা ফরমায়েশ প্রদানের অধিকার কোনও ছন্দন্দোবিদেরই নেই। কিন্তু ছন্দোবিচারের এই মূলনীতিটি বিস্মৃত হ'য়ে কোনো কোনো ছন্দোজিজ্ঞাসু আপন রুচি ও মর্জি-অনুসারে বাংলা ছন্দের নানা নূতন সূত্র ও সংজ্ঞা প্রণয়নের কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমধিক আগ্রহী; ফলে বাঙলায় প্রায়-সর্বজন গ্রাহ্য ছন্দ-পরিভাষা ও ছন্দ-ব্যাকরণ অদ্যাবধি গ'ড়ে উঠতে পারছে না। এটা পরিতাপের বিষয় বৈ কি।

## পাদটীকা

১ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, তৃতীয় সংস্করণ, ৩০-৩২ পৃ.

২ বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। সাহিত্য-পত্রিকা শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ সন; ১৩৬-১৬৪ পৃ.

৩ কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', প্রথমাংশ, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা। শ্রীকালিদাস রায় তাঁর 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বলেছেন: "বিদ্যাপতির প্রধান ছন্দ পজঝটিকা; এই ছন্দ হইতেই পয়ারের জন্ম হইয়াছে।" (প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ৫১ পৃষ্ঠা।) তাঁর এই ভ্রমাকীর্ণ ছন্দোব্যাখ্যা পরবর্তীকালে অনেককে প্রভাবিত করেছে।

৪ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ৪৬-৪৭ পৃ.

৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩১১ সাল।

৬ পরিচারিকা, জৈষ্ঠ্য, ১৩২৪ সন।

৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ--চৈত্র, ১৩৭৫ সন, ২২২ পৃষ্ঠা

৮ ভাষার ইতিবৃত্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৭৫-৬ পৃ.

৯ প্রাগুক্ত, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১০ প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৯ সন।

১১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৫ সন, ২২০ পৃষ্ঠা।

১২ বাঙলা ছন্দের বিবর্তন; প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮ জুলাই; প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। উৎসর্গ "আমার শিক্ষাগুরু আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু।"

১৩ প্রাগুক্ত; ৫-১২ পৃ.

১৪ আনন্দবাজার পত্রিকা; শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫২ সন।

১৫ মাহে-নও; ভাদ্র ১৩৬০ সন।

১৬ ছন্দ-পরিক্রমা; পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; ১০ ও ১২ পৃ.

১৭ বাংলা ভাষা-পরিচয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৬শ খণ্ড, ৪০১-০২ পৃ.

১৮ প্রবাসী; আষাঢ়, ১৩২১ সন; ২৭৩ পৃষ্ঠা।

১৯ ছান্দসিকী; দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫০ পৃষ্ঠা।

২০ বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা; ১১৪ ও ১৩৪ পৃ.

২১ ছন্দ-সরস্বতী; তৃতীয় প্রকাশ। ভারতী, বৈশাখ ১৩২৫ সন।

২২ কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার-কৃত অনুবাদ—
নিজেরে নিজেই জানি না যখন, জানিব কেমনে কে ভগবান?
নই খ্রীষ্টান, ইহুদা-ও নই, কাফের কিম্বা মুসলমান।

২৩ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-কৃত অনুবাদ—
বিশ্ব-করুণা গঞ্জ-বখ্‌শ, ঐশী জ্যোতির অভিব্যক্তি।
অভাজনে করো মহা-দরবেশ, দরবেশে দাও দৃষ্টিশক্তি॥

২৪ ফারসী 'হজয' ছন্দে হাফিজের দীওয়ানের একটি সুবিখ্যাত গজল—
V — — — | V — — — | V — — — | V — — —
অগর্ আঁ তুর্ কি শীরাজী ব দস্ত্ আ-রদ্ দিলে মা-রা।
বখালে হিন্- দুয়াশ্ বখ্‌শাম্ সমর্‌কন্দ্ ও বুখারা-রা॥

ফারসী 'হজয' ও লাতিন Epiritus Primus অনন্যপ্রকার ছন্দ; উভয়েরই প্রতি পদ চতুঃস্বরিক তার প্রথম স্বর হ্রস্ব এবং অবশিষ্ট তিনটি স্বর দীর্ঘ বা রুদ্ধ। কাজী নজরুল ইসলাম এই বয়েতটির 'বাংলা প্রতিরূপ' তৈরী করেছেন এভাবে—

V— —— | V—— — | V— — — | V— — —
যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,
সমর্‌খন্দ আর বুখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিল্‌টের।
(নির্ঝর, দীওয়ান-ই-হাফিজ, গজল: ৬)

এবং শ্রীদিলীপকুমার রায় এর পংক্তি ৩+৫+৩+৫ সিলেবলে বিভক্ত ক'রে এর তর্জমা করেছেন এরূপ—

৩ | ৫ | ৩ | ৫
আমার সেই অন্তরের কান্তা মিলন তার চায় উছল মোর প্রাণ,
তিলের তার করতে তর্পণ দেই সমর্‌কন্দ্ আর বুখারায় আর দান।
(ছান্দসিকী, ২২০ পৃষ্ঠা। সাঙ্গীতিকী, ৮০ পৃষ্ঠা।)

এই দু'টি অনুবাদেই 'ফার্সি ছন্দের লঘুগুরু' পদ্ধতিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ভাবিত 'প্রস্বনী প্রকৃতি' প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যযুগে লোচন দাস এই ফারসী রীতি ভেঙেই ভাঙা-স্বরবৃত্তে রচনা করেন ধামালী। যথা—
ব্রজপুরে রূপনগরে রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া লাগিল গোরা- গায়॥ ...
রূপ-ভাবনা গলায় সোনা ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল-পারা বহিছে জগৎ আঁধা॥
(বিবর্ত-বিলাস)

এখানে 'লাগিল গোরা', 'ঘুচিবে মনের' এবং 'বহিছে জগৎ' প্রত্যেকে চতুঃস্বরিক না হয়ে পঞ্চস্বরিক হয়েছে; ছন্দ সুঠামও হ'তে পারে নি। গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত 'চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে তেরছ নয়ানে চায়'—এ-ধরণের পংক্তিও ভাঙা-স্বরবৃত্তেরই নমুনা। শেখ মদন বাউলের "তোমার/পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে"; "যদি/।করিস্ মানা, ওগো বন্ধু, মানি এমন সাধ্য নাই",—প্রভৃতি সাধন-গানে স্বরবৃত্ত লাভ করে তার সুগঠিত সুমার্জিত রূপ। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যে ঘটেছে বাঙলা ভাষার এই স্বাভাবিক ও সুপ্রাচীন ছন্দের চরম বিকাশ।

২৫ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ; ১২৮ পৃষ্ঠা।

২৬ কাব্যনির্ণয় (১৮৬২ খ্রীঃ); নবম সংস্করণ, ১০৪ পৃষ্ঠা।

২৭ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

২৮ মাত্রাত্রয়োদশকং যদি পূর্ব্বং লঘুকবিরামি।
পশ্চাতেকাদশকন্তু দোহড়িকা দ্বিগুণেন।।
(ছন্দোমঞ্জরী; পঞ্চমস্তবকঃ।)

২৯ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য; প্রথমাংশ, ১ম ও ২য় খণ্ড; ৯ পৃষ্ঠা।

৩০ ১৮০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ', তৃতীয় খণ্ড।

৩১ এ-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন মৎলিখিত প্রবন্ধ: 'বাংলা ছন্দের বিবর্তন: কৃত্তিবাস থেকে মধুসূদন'; বাংলা একাডেমী গবেষণা-পত্রিকা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৩ সন; ৪৪-৪৫এবং ৭০-৭১ পৃ.।

৩২ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য মৎলিখিত প্রবন্ধ: 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও ছন্দ'; পূর্বাচল, আষাঢ় ১৩৮০ সন।

৩৩ এ-বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনার জন্য দেখুন মৎলিখিত নিবন্ধ: 'নজরুল-কাব্যের আঙ্গিক বিচার'; বাংলা একাডেমী গবেষণা-পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ সন।

৩৪ 'স্বাগতা' ছন্দের সংস্কৃত ছাঁদ—

—V-- VVV— VV —
আহবং প্রবিশতো যদি রাহুঃ,
পৃষ্ঠতশ্চরতি বায়ু সমেতঃ।
প্রাণবৃত্তিরপি যস্য শরীরে,
স্বাগতা ভবতি তস্য জয়শ্রীঃ।।
(পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম; ষষ্ঠ অধ্যায়)

'স্বাগতা' একাদশাক্ষরা বৃত্তিঃ ত্রিষ্টুপ: এর পংক্তিতে প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ অক্ষর গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক, এবং অবশিষ্ট ছয়টি অক্ষর লঘু অর্থাৎ একমাত্রক। নজরুলের গানটির দ্বিতীয় পংক্তিতে 'নৃত্যর' শব্দের পাঠ 'নৃত্যে' হলে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ রীতি ঠিক রক্ষিত হয়, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দরীতির দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটে।

৩৫ রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' কাব্যনাটকের ছন্দ প্রধানতঃ দ্বাদশমাত্রক দীর্ঘ-একাবলী; তাতে মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যক একাদশমাত্রক একাবলী শ্লোক আছে এবং নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে ৬+৬ মাত্রা-ভাগের পংক্তির সঙ্গে ৭+৬ মাত্রা-ভাগের ত্রয়োদশমাত্রক পংক্তি কাঁধ মিলিয়েছে—

কিনি বিনি কাশী স্থির হ'য়ে থাকো,
খবর্দ্দার কেউ নোড়ো চোড়ো না কো।

এখানে 'খবর্দ্দার কেউ' ছয়-অক্ষর সাত-মাত্রা; এটিকে ষন্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত স্থলে ষড়ক্ষর অক্ষর বৃত্তের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

৩৬ 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা' প্রবন্ধ। পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৮ সন; ৯১ পৃষ্ঠা।

৩৭ প্রাগুক্ত; ৮৮ পৃষ্ঠা।

৩৮ ছন্দ; 'বাঙলা ছন্দের প্রকৃতি'।

৩৯ কবিতার ক্লাস (বৈশাখ ১৩৭৭); দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৪০ 'স্বাভাবিক ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ', সূর্যাবর্ত (পৌষ ১৩৬৮), ১০৫ পৃষ্ঠা।

৪১ কবিতার ক্লাস; ১১৫ পৃষ্ঠা।